উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ১ ফাল্গুন ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৬৬ সংখ্যা

চাপে নত পাকিস্তান

নতিস্বীকারে বাধ্য হল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে জঙ্গি সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান হাফিজ সঈদকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান। মঙ্গলবারই সে দেশের প্রেসিডেন্ট এই সংক্রান্ত একটি অর্ডিন্যান্সে সই করেছেন। শুধু হাফিজ সঈদ নয়, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যেসব সংগঠনকে ইতিমধ্যেই জঙ্গি তকমা দিয়েছে, এদিনের অর্ডিন্যান্সে সেইসব সংগঠনকেও নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে হাফিজ সঈদ প্রসঙ্গে নরম মনোভাব দেখানোর পর মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল পাকিস্তান। তবে এর পিছনে ভারতের অবদানও অনেকটাই। মুম্বইয়ের ২৬/১১ হামলার মূল চক্রী হাফিজ সঈদের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই এই হামলায় তার জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ ইসলামাবাদকে দিলেও পাকিস্তানের প্রশাসকরা তা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। অনেকদিন আগে থেকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং সন্ত্রাসবাদীকে মদত না দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ তৈরি করছিল আন্তর্জাতিক মহল। আমেরিকা এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন এই ব্যাপারে একাধিক হুমকি দেওয়া হলেও তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। তার মূল কারণ, আমেরিকার সেই পদক্ষেপ শুধুমাত্র হুমকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানকে দেওয়া সাহায্য বন্ধ করার পথে হাঁটেননি ওবামা। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী ডোনাল্ড ট্রাম্প সন্ত্রাসবাদ বন্ধে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারির পর সাহায্য বন্ধের কথাও ঘোষণা করেছেন। আর এই ঘটনাতেই নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান প্রশাসন। এর আগে হাফিজ সঈদকে জঙ্গি হিসাবে মানতেই চায়নি তারা। বরং সেখানে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে হাফিজ। এমনকি কড়া ভারত বিদ্বেষী বয়ান দেওয়ার পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে 'মুক্ত' করা, সেখানকার 'স্বাধীনতা যুদ্ধে' সক্রিয় সহযোগিতার পথে হেঁটেছে। লস্কর-ই-তৈবা, হরকত-উল-মুজাহিদিন, তেহরিক-ই-তালিবান, ফলাহ-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন ইত্যাদির সঙ্গে হাফিজের সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়া সক্রিয়ভাবে এদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দিয়ে এসেছে। তারপরেও হাফিজ সঈদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যে কোনো আইনি পদক্ষেপ করবে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খাকান আব্বাসী। কারণ হাফিজের বিরুদ্ধে নাকি পাকিস্তানে কোনো মামলাই নেই। এরপরেই আরও একধাপ এগিয়ে সেদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশারফ হাফিজ সঈদ এবং তার সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়াকে রীতিমতো দেশপ্রেমী আখ্যা দেন। তবে পরবর্তীকালে হাফিজকে যে কিছুদিনের জন্য গৃহবন্দি করে রেখেছিল পাকিস্তান তা ভারত এবং আমেরিকার চাপে। যদিও তার মেয়াদ বেশিদিন ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাকিস্তানকে সাহায্য ছাঁটাইয়ের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সেটা মারণাস্ত্র হয়েই দাঁড়ায়। পাকিস্তান হাফিজকে জঙ্গি ঘোষণা করতে বাধ্য হল। সেইসঙ্গে, রাষ্ট্রসংঘ যে ২৭টি সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল তার মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাকিস্তানের সংগঠনের বিরুদ্ধেও এবার ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের। অবশ্য এই পদক্ষেপ ছাড়া বিকল্প উপায়ও ছিল না পাকিস্তানের। কারণ এরপরেই ভারত এবং আমেরিকার চাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তান প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর পরেই আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনও পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে। এরপর জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কিংবা হাফিজ সহ ওইসব সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতারের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হলে এই ভারতীয় উপমহাদেশ তো বটেই, অন্যত্রও পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে কাশ্মীরের শান্তিকামী মানুষ।

অমৃতধারা

বর্তমান জগতে অনেকে বলছেন- যদি শান্তি পেতে চাও, যদি সুখ পেতে চাও, যদি আনন্দ পেতে চাও তাহলে ভগবানকে পুজো করো, ভগবানকে ভক্তি করো, ভগবানের জন্য কাঁদো, ভগবান লাভের জন্য ঘরসংসার ত্যাগ করো। যোগীরাজ শ্যামাচরণ কিন্তু ওসব কিছুই বলেন না মানুষকে। তিনি বরং উলটো কথাটি বললেন। তিনি বললেন, ভগবান আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো বস্তু নন যে ঝপ করে তুমি তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। অদ্ভুত কথা, এমন কথা তো আগে শোনা যায়নি। যদি কেউ বলে ভগবানকে ডাকতে হবে, তাঁকে ডাকার পদ্ধতিটা কী ? তাঁকে ডাকতে গেলে তো তাঁকেই চাই। যদি কেউ বলে পুজো করলে তাঁকে পাওয়া যাবে, এই পুজো করতে গেলেও তো তাঁকে চাই। হাতে ফুল নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে পূজা নিবেদন করা হয়। হাত যদি পূজা নিবেদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মৃতদেহের পূজা নিবেদন করতে পারে না কেন ? আসলে মৃতদেহের কোনো ক্ষমতাই নেই, শুধু একজনের অভাবে। অর্থাৎ যাই কিছু করি না কেন, সর্বাবস্থায় তিনিই বর্তমান। তাঁকে বাদ দিয়ে যখন কোনো কাজই সম্ভব নয়, তাহলে ওই ডাকাডাকি, কান্নাকাটি, পূজা অর্চনাদির প্রয়োজন আছে কি ? ডাকে কে ? মন, ইন্দ্রিয়। চিন্তাভাবনা করে কে ? মন, ইন্দ্রিয়। পূজা করে কে ? দেহ, মন, ইন্দ্রিয়। কিন্তু যাঁকে পেতে চাইছি তিনি যে অতীন্দ্রিয়। সবার ভেতরে যে প্রাণ, তার জন্যই সবাই বেঁচে আছে, এককথায় সবাই কর্ম্মমুখর। তিনি নাই তো, বলহরি। প্রাণ ছাড়া এ জগতে কিছু নাই, এ বিশ্বজগৎ প্রাণময়।

-বাচস্পতি অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

শব্দরঙ্গ ■ ১৯২২

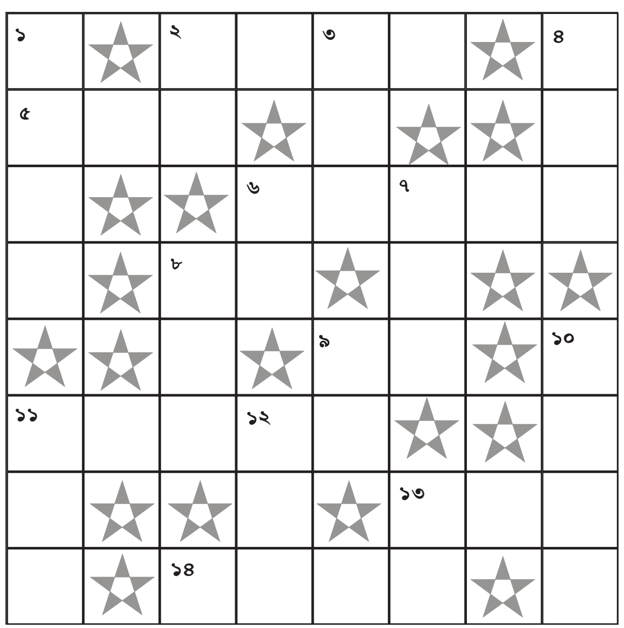

পাশাপাশি ঃ ২। হ্যাংলা, লোভাতুর ৫। এক নিমেষ বা ক্ষণমাত্র ৬। আদেশ, নির্দেশ বা হুকুম ৮। বিস্তৃত লেজওয়ালা এক ধরনের পায়রা ৯। গায়ের জোর, খেলার জিনিস ১১। বিরোধ বা মন কষাকষি ১৩। সম্পর্ক, সংযোগ বা বিয়ের জন্য যোগাযোগ ১৪। যতগুলো হত্যা করে মাপ পাওয়া যায়।

উপর-নীচ ঃ ১। উপযুক্ত বা যথাযোগ্য ২। রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ ৩। ছোরা বা চাকুর মতো অস্ত্র ৪। সমূহ ক্ষতি বা ধ্বংস ৬। ফাঁকি বা কিছুই না ৭। ঢোল জাতীয় বাজনা আদিবাসীদের কাছে দেখা যায় ৮। সময় খুবই অল্প ৯। যারা বনে বাস করে ১০। বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে ১১। পল্লি বা পাড়া ১২। যা লেখা হয়ে আছে ১৩। বছর বা সাল।

সমাধান ■ ১৯২১

পাশাপাশি ঃ ১। পশ্চাত্তাপ ৩। সুরাহা ৫। অন্দরমহল ৬। তমিজ ৭। যামিনী ৯। আকাশকুসুম ১২। পলকা ১৩। মরীচিকা।

উপর-নীচ ঃ ১। পরিচিত ২। পছন্দ ৩। সুগম ৪। হাসিল ৫। অজ ৭। যাম ৮। নীহারিকা ৯। আলাপ ১০। শলাকা ১১। সুঠাম।

ভালোবাসার রাংতা ওড়ে

শ্রীজাত

চকোলেটের কথা আমার তেমন মনেই পড়ে না। বরং এখনও ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতির খুঁটে কোনোরকমে লেগে রয়েছে তাদের সোনালি-রুপোলি রাংতাগুলোর কয়েক টুকরো। কারণ আর কিছুই নয়, ওদের জন্যই চকোলেটকে ভালোবেসেছিলাম আমি।

তখন খুব ভালোবাসতে পারতাম। তখন, মানে বেশ ছোটোবেলায়। যখন নারীদের মধ্যে মা আর বোনেরাই বেশি প্রিয় ছিল। চে গেভারাকে না-চিনলেও মারাদোনার ছবিতে গর্বিত চুমু খেতাম। সেই তখন, যে কোনো পছন্দের জিনিসের প্রতি একটা নিঃশর্ত লয়্যালটি, টানটান ভালোবাসা কাজ করত। সেই তখন থেকেই আমি রাংতা জমাতাম। চকোলেটের। প্রচুর চকোলেট যে উপহার পেতাম হয়তো, আর তা নিয়েই আনন্দের অন্ত থাকত না। এই ধরনের অল সিজন সেরা উপহার ছিল চকোলেট। যদ্দুর মনে পড়ছে, ইদানীংকার এ-ফোর সাইজের স্বাস্থ্যবান প্যাকেজগুলো তখনও জন্মায়নি। একটা ছোটো, আরেকটা বড়ো-এই দু-সাইজের চকোলেট বিক্রি হত। বড়ো চকোলেট কস্মিনকালেও হাতে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। পেলেও আমার ঐতিহাসিক পেটে তা সহ্য হত না নির্ঘাত। আমরা তো অল্পে খুশি, কী হবে দুঃখ করে? আমি তাই ক্বচিৎ কদাচিতের ছোটো চকোলেট নিয়েই বিভোর হয়ে থাকার অভ্যেস তৈরি করেছিলাম।

বেশির ভাগ চকোলেটই, মনে পড়ে আমার, মায়ের হাত থেকে পাওয়া। বাবা 'যুগান্তর'-এর সাংবাদিক ছিলেন। পদখানা মন্দ না হলেও মাসান্তে পারিশ্রমিক বিশেষ রাশভারী কিছু ছিল না। এখনকার বাবাদের দেখি রোজই ফেরার সময় ছেলে বা মেয়ের অর্ডারি-আবদার কিনছে। এ ব্যাপারে আমাদের অতি দুঃসাহসিক কল্পনাতেও ছিল না। বরং বাবা যে বাড়ি ফিরে বকাঝকা করছে না বা দু-চারটে চড়চাপাটি লাগাচ্ছে না, এটাই এক ধরনের উপহার ছিল। সে যা হোক, বাবা রোজই অফিস যেত, কিন্তু বিশেষ উপহারপ্রবণ হয়ে ওঠার সামর্থ্য ছিল না। মা বরং বেরোত কখনও-সখনও, সম্ভব হলে কিছু না কিছু নিয়েই ফিরত। তখনও রোজগারের তাগিদে অন্যের বাড়ি গিয়ে গান শেখাত মা। মাসের প্রথমদিকে তাই খুব অপেক্ষা করে জেগে থাকতাম মায়ের টিউশনির সন্ধেগুলোয়, যদি কিছু নিয়ে ফেরে! কিছু মানে চকোলেট। তখন আমরা চকোলেট কথাটা জানলেও, ক্যাডবেরি বলেই ডাকতাম তাকে। ক্যাডবেরির একটা ছোট্ট ডেয়ারি মিল্ক চকোলেট পাওয়া যেত বাজারে, একটা ফুটের স্কেলকে চারভাগ করলে যেমন দাঁড়ায়, ঠিক তেমন সাইজের। গাঢ় বেগনির উপর সাদা দিয়ে ক্যাডবেরি লেখাটা দেখতেই স্বপ্নের মতো লাগত। আর ওই বেগনি রংটার উপরে কী যে লোভ ছিল আমার! রংটা স্বাভাবিকভাবেই খুব মিষ্টি ছিল সে সময়, কারণ তার ভিতর মুখ লুকিয়ে থাকত খোদ ক্যাডবেরিটাই। তো মাসের গোড়ার দিকে, গান শিখিয়ে ফেরার পথে কখনও সখনও মায়ের হাতব্যাগে ঢুকে পড়ত ক্যাডবেরির ওই ছোট্ট সংস্করণ। ঘুমচোখে মায়ের হাত থেকে সেই একচিলতে বেগনি রঙের স্বপ্ন যখন উপহার পেতাম, মনে হত বেঁচে থাকার চাইতে ভালো কিছু আর হয় না।

সেটা কিন্তু কেবল ভিতরকার অভাবনীয় চকোলেটের কারণে নয়। চকোলেট তো মুহূর্তে শেষ। এমনিতেই তখনও আমাদের ফ্রিজ ছিল না বলে এই ধরনের খাবার বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখা যেত না (যেন ফ্রিজ থাকলেই কত রাখতাম!), আর গলে যাওয়া চকোলেট আঙুলে মাখামাখি হওয়ার ব্যাপারটা আমার ছোটো থেকে অপছন্দ ছিল। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম। কিন্তু ওই মুহূর্তে অন্তঃসারকে আত্মসাৎ করার পরেও যেটা থেকে যেত, সেটা হচ্ছে একখানা রাংতা। একদিকে সোনালি, উলটোদিকে রুপোলি। আমার ছোটোবেলার অন্যতম বিস্ময় আর খুশির কারণ হয়ে ওঠা সেই রাংতাগুলো আমি ফেলতাম না। জমিয়ে রেখে দিতাম। কখনও চাদরের তলায়, কখনও জুতোর বাক্সে, কখনও পড়ার বইয়ের ফাঁকে। হাতের কাজে গৃহশোভা বাড়ানোর সুনাম কোনোকালেই আমার ছিল না, রাংতাগুলো যে আমার অঙ্কুরিত ক্রিয়েটিভিটির প্রমাণ হয়ে উঠবে একদিন, সে দাবিও তারা রাখেনি। কেবল জড়ো করার জন্যই এক জায়গায় রেখে দিতাম তাদের। হয়তো আর কিছুই না, এমনকি আমিও যে কখনও উপহার পাই কিছু কিছু, তারই চিহ্ন হিসেবে হয়তো পুষে রাখতাম। মাঝেমধ্যে বই খুলে, বাক্সের ঢাকা সরিয়ে অবাক চোখে দেখতাম, জিভে নরম বিদ্যুতের মতো চকোলেটের স্মৃতি-স্বাদ খেলে যেত। আবারও কোনোদিন ফেরার পথে মা কিনে আনবে একখানা আস্ত চকোলেট--ভেবেই একটা হালকা আয়েশে ডুব দিতাম।

আমার চকোলেটবিলাস কিন্তু ছোটোবেলাতেই ব্রেক কষেছে। প্রেমের সমীকরণে তাকে বড়ো একটা আঁক কষতে দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কী, আমরা যখন প্রেমিক হলাম, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে গজল গাইছে ছোটে গোলাম। যারা যখন যাদের ভালোবেসেছি, বড়োজোর একটা চিরকুট অবধি এগোতে পেরেছি। বেশির ভাগ সময়ই সেসব চিরকুটের আগাম নেগেটিভ উত্তর জানা ছিল বলেই হাতখরচের টাকা উড়িয়ে কেউ চকোলেটে ইনভেস্ট করতাম না। তখন অবশ্য মেজো-সেজো-রাঙা চকোলেটের দিন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাক্সবন্দি হরেক রকমের জিভে জল কম্বিনেশনও যথেষ্ট ইন-থিং, কিন্তু কেন কে জানে, আমাদের প্রজন্মের মেনস্ট্রিম ভালোবাসায় চকোলেট কখনও বড়ো রোল পায়নি। বড়োজোর এন্ড ক্রেডিট-এ চিলতে উল্লেখ।

তবে হ্যাঁ, রাংতাকাব্যের একখানা চল ছিল বটে। টু-বি পেনসিলের ছায়াময় আখরে স্বরচিত কবিতার চারখানি কালজয়ী লাইন রাংতায় লিখে তার হাতে তুলে দেয়নি, এমন কিশোর আমাদের প্রজন্মে হাতে গোনা। যারা দেয়নি, তারা নট টু-বি'র দলে অবশ্যই। তবে আজ লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে স্বীকার করতে পারি, আমিও নির্ঘাত নট টু-বি উত্তর আসবে জেনেও এ-কাজ করেছি। অন্যের প্রতি প্রেমের চেয়েও নিজের লেখার প্রতি আশ্চর্য আস্থাই ছিল আদত কারণ। তবে একথাও ঠিক, ততদিনে রাংতার চরিত্র পালটে গিয়েছে। ক্যাডবেরি আর নয়, চারমিনার। একদিকে রুপোলি, অন্য পিঠ সাদা। নাকের কাছে নিলেই কড়া ইচ্ছের চড়া গন্ধ। সেসব রাংতারও ঘোড়ার খুরে খুরে দিগন্তে টপকে হাওয়ায় মিশে গিয়েছে... সিগারেট আর চকোলেট-দুটোই ছেড়েছি।

বহুদিন পর আবার সেই অব্যর্থ মুঠো-উপহারের পাল্লায় পড়তে হল প্রায় এক দশক আগে, দূর্বা-র সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার পর। অবশ্য তার আগে থেকেই নেট-প্র্যাকটিসটা শুরু হয়েছে। মানুষ দুর্বলতার কথা বেশিদিন চেপে রাখতে পারে না। দূর্বা-র অল্পস্বল্প রাগ ভাঙানোর জন্য ফ্রুট অ্যান্ড নাট চকোলেটের একটা ছোট্ট প্যাকই যথেষ্ট, এইটা জেনে যাওয়ার পর আমার অনেকটা সুবিধে হল। রাগের কারণগুলো কমিয়ে আনা বেজায় কঠিন, তার চেয়ে ড্যামেজ কনট্রোলের উপায়টা কাজে লাগানো সোজা।

মনে পড়ে, তখন আমি গড়িয়ায় থাকি, ওদের বাড়ি সেলিমপুরে। কোনো একটা কারণে হয়তো খেপে আছে, বাড়ি ফেরার পথে একটা ছোট্ট ফ্রুট অ্যান্ড নাট কিনে মুঠোয় পুরে দিয়ে নিভৃতে আলগা হয়ে গেলাম হয়তো। অবশ্য শুধু নাটে কাজ হত না, নাটের গুরু হিসাবে একখানা ছোটোখাটো কবিতাও লাগত। যদিও রাংতার আর জায়গা হত না, কোনো না কোনো চিরকুটে কবিতা রেখে দিয়ে আসতাম। সেসব চকোলেট নিমেষে হজম হত নিঃসন্দেহে, লেফটওভার রাগটুকু কমিয়ে দিতে পারত ওই একচিলতে কবিতাই। তারাই যখন আমার জীবনের রাংতা। সেসব রাংতা কোনো একটা খাতায় যেন টুকেও রাখত দূর্বা--ক্ষণিক ছন্দকারসাজি হয়তো আজও রয়ে গিয়েছে ওর হাতের লেখায়, কোনো গোপন বাক্সে। এখনও যখন বেদম রেগেটেগে যায় বলে বুঝতে পারি, ফেরার পথে একখানা ফ্রুট অ্যান্ড নাট ঝুলিতে পুরে আনি। তবে হ্যাঁ, কৈশোর-যৌবনের সেই কবিতা-রিফ্লেক্স আর কাজ করে না। চাইলেই চার লাইন কাব্যিকে কবজিগত করে ফেলার কায়দা এখন হাত ছাড়িয়ে বহু দূরে। হয়তো সেই জন্যই চকোলেট পেয়ে দূর্বা-র রাগ পড়ে এলেও, সঙ্গী চিরকুটখানা না পেয়ে মুখ একটু ভার হয়ে যায়।

কী অবাক কাণ্ড, আমাদের বয়স হওয়াটা আটকানো গেল না। দুপুর পেরোই-পেরোই ভাব চারপাশে। শীতের জানলা পেরিয়ে ভরা বসন্তে ভালোবাসার দিনে রাংতা উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। জমানোর দিন শেষ, ওড়ানোর বেলা শুরু। জমাট সময় গলতে শুরু করেছে।

বহুদিন পর আঙুলে মাখামাখি হওয়া সত্ত্বেও আজ ভালোবাসার দিনে হয়তো মন্দ লাগবেও না। বাকি সময়টুকুর মিঠাপন যেন চেটেপুটে চেখে নিতে পারি, এইটুকুই চাওয়া। কে আর কবে রাংতা জমিয়ে রাখতে পেরেছে!

চিরকুটের আগাম নেগেটিভ উত্তর জানা ছিল বলেই হাতখরচের টাকা উড়িয়ে কেউ চকোলেটে ইনভেস্ট করতাম না। তখন অবশ্য মেজো-সেজো-রাঙা চকোলেটের দিন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাক্সবন্দি হরেক রকমের জিভে জল কম্বিনেশনও যথেষ্ট ইন-থিং, কিন্তু আমাদের প্রজন্মের মেনস্ট্রিম ভালোবাসায় চকোলেট কখনও বড়ো রোল পায়নি।

বহুদিন পর আঙুলে মাখামাখি হওয়া সত্ত্বেও আজ ভালোবাসার দিনে হয়তো মন্দ লাগবেও না। বাকি সময়টুকুর মিঠাপন যেন চেটেপুটে চেখে নিতে পারি, এইটুকুই চাওয়া।

প্রেম–প্রেম

জনমত

হিংসা-দ্বেষ ভুলে প্রতিদিনই হোক ভালোবাসার দিন

'আজ ভ্যালেন্টাইনস' ডে অর্থাৎ ভালোবাসার দিন। পশ্চিমি দেশগুলোতে বহু বছর আগে থেকেই এই দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বায়নের জেরে এই দিনটি এখন বাংলার অলিগলি সহ সারাদেশে খুব ঘটা করে পালিত হয়। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উপলক্ষ্যে জমে ওঠে নামিদামি কার্ডের পসরা, রক্তগোলাপ সহ নানা উপহার সামগ্রীর দোকান। তবে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করতে প্রায় সকল যুবক-যুবতি ব্যস্ত। যাইহোক, এই দিনটির উৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনসের নামানুসারে এই দিনটির প্রচলন। কিন্তু ভালোবাসার কী কোনো নির্দিষ্ট দিন, তারিখ থাকে ?

প্রেম কখন কার মনে নিজের অজান্তে জেগে ওঠে তা বলা খুবই মুশকিল। সুফি কবি আলওলের ভাষায় - প্রেম বিনা ভাব নাহি, ভাব বিনা রস/ ত্রিভুবনে যত দেখি প্রেম হস্তে বশ। কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই প্রেমের আরাধনায় সংসারত্যাগী হয়েছিলেন। তাঁরা নরনারীর জাগতিক প্রেমের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক প্রেমের মাধুর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রেম মানে না ধনী-গরিব, ফর্সা-কালো, জাতপাত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভ্যানচালক, টোটোচালক, বয়স, দিন, তারিখ। তাই বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনকে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' অর্থাৎ 'ভালোবাসার দিন' হিসাবে পালন করা হাস্যকর ব্যাপার মনে হয়।

তবে হিংসাত্মক পৃথিবীতে যথার্থ ভালোবাসার বড়োই অভাব। বাজারি মনোভাব গ্রাস করে নিচ্ছে মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিকে, ভালোবাসার নামে চলছে ছলচাতুরীর মতো জঘন্যতম কাজ। বর্তমানের বিবর্ণ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাসের ফুল ফোটে এবং গর্ভবতী প্রেমিকারা প্রেমিকের বাড়ির দরজায় অথবা থানার সামনে ধরনায় বসে কাতরাতে বাধ্য হয়। আজ রাজনীতির বিষবাষ্পে প্রতি মুহূর্তে খর্ব হচ্ছে মানুষের বাঁচার অধিকার। চারদিকে ওঁত পেতে আছে মৃত্যুর কালো ছায়া। বারুদের স্তূপের উপর ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা জোর গলায় বলতে পারি- প্রেম তুমি অতীতেও ছিলে, এখনও আছ, আগামীদিনেও থাকবে অমর অক্ষয় হয়ে। কোনো পাশব শক্তি তোমাকে হার মানাতে পারবে না। তবে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে তুমি ছড়িয়ে পড়ো সর্বত্র। বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, যুবক-যুবতি, শিক্ষক-ছাত্র, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সবার ক্ষেত্রেই ভালোবাসা প্রযোজ্য। পাত্র হিসাবে হয়তো এক-একজনের ব্যাপ্তি এক-এক রকম। আসুন হিংসা, দ্বেষ, ভুলে গিয়ে প্রকৃত ভালোবাসাকে সম্বল করে নতুনভাবে আমরা বাঁচতে শিখি। সারা বছরই আসুক ভালোবাসার দিন। সত্যিকারের ভালোবাসার সৌরভে ভরে উঠুক সারা বিশ্ব।

গৌতম দাস, শিক্ষক
উল্লারঘাট রোড, তুফানগঞ্জ।

পরিবহণ ব্যবস্থায় কিছু কড়া নিয়ম চালু হোক

'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে সরকারি ব্যবস্থা প্রশংসার দাবি রাখে। তবুও মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে, যা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মকানুন কঠোরভাবে কার্যকর করা দরকার। যেমন -

১. গাড়িতে ড্রাইভারদের মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা। তাঁদের পরিবার বিশেষ প্রয়োজনে অফিসের সঙ্গে যাতে সহজেই যোগাযোগ রাখতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

২. গাড়িতে গান চালানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. ড্রাইভারদের একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়ে পরবর্তীতে তাঁদের দপ্তরে অন্য কাজে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. ডিউটি ঠিক কত ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যসম্মত বিধি দরকার।

৫. কিছুদিন পরপরই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬. গাড়ির স্বাভাবিক গতিবেগ (রাতে/ঘন কুয়াশায়/ ব্রিজের ওপর) কতটা হবে নির্দিষ্ট করা হোক।

৭. খারাপ আবহাওয়া বা ঘন কুয়াশায় সম্পূর্ণরূপে যান চলাচল স্থগিত রাখা দরকার।

৮. ওভারটেকের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

৯. ড্রাইভারদের বেতনক্রম যথেষ্ট ভালো থাকা দরকার। কারণ তাঁদের কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের উপর নির্ভর করে বহু মূল্যবান জীবন।

১০. গাড়ি ছাড়ার আগে ড্রাইভার নেশাগ্রস্ত কিনা এবং অন্যান্য পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা বাঞ্ছনীয়।

১১. যানবাহনে নির্দিষ্ট সংখ্যার প্যাসেঞ্জার ও মালপত্র তোলার বিষয়ে স্পষ্ট নজরদারি ও কড়া ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

এছাড়া গাড়িতে, ব্রিজে সিসি ক্যামেরা থাকা ও গাড়িগুলো আধুনিক করা দরকার। গাড়ির প্রতিটি জানলা বড়ো রাখতে হবে। সহজেই খুলে ফেলার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থাদি রাখতে হবে। এ ধরনের অনেক নিয়ম-নির্দেশই হয়তো থাকে। হয়তো অনেক কিছুই মানা হয় না। এগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে মানুষ ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাবে। তবে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ ' সার্থকতা পাবে।

নির্মল বিশ্বাস
দেবীনগর, আলিপুরদুয়ার।

ডাকঘর বার্তা

রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন এবার থেকে ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে ডাকঘর থেকেও। যে সমস্ত অঞ্চলে কাছাকাছি রেলের টিকিট কাউন্টার নেই সেই সব এলাকার মানুষদের সুবিধার্থে এ ব্যবস্থা। দেশের ২৮০টি ডাকঘরে মিলবে এহেন সুবিধা। ডাকঘরে কার্যত কাজই হয় না। টাকা জমা দেওয়া, তোলা, সার্টিফিকেট ম্যাচিয়োর হলে তা ভাঙানোর কাজই হয় গ্রাহককে দশবার ঘুরিয়ে। এখন রেলের টিকিট ! ব্যবস্থাটা মনে হয় থেকে যাবে স্রেফ খাতা কলমে।

শেফালি সরকার
চম্পাসারি, শিলিগুড়ি।

পরিবহণমন্ত্রী দৃষ্টি দিন

আমরা যারা উত্তরবঙ্গের মানুষ, বিভিন্ন কারণে আমাদের কলকাতা যেতে হয়। আমরা এই দিকের মানুষ হওয়ার কারণে কলকাতায় স্থানীয়ভাবে যাতায়াত করতে ট্যাক্সির উপরেই ভরসা করতে হয়। প্রশ্ন হল, এই ট্যাক্সির পরিসেবা আমরা কীভাবে পেতে পারি। প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খালি ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে যখন গন্তব্যস্থলের কথা বলি, উত্তরে হয় যাব না বা ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। কারণ হিসাবে বলা হয়, তেলের দাম বেড়েছে, তাই। এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ট্যাক্সি দেখা যায় যাদের গায়ে লেখা থাকে 'no refusal', উৎসাহিত হয়ে তাদের দাঁড় করাতে চাইলে, তারাও পাত্তা দিতে চায় না। দাঁড়ায় তো বাড়তি ভাড়া দাবি করে। আমরা উত্তরবঙ্গবাসী সত্যিই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ি। মাননীয় পরিবহণমন্ত্রী যদি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। মাননীয় মন্ত্রীর ইতিবাচক পদক্ষেপের আশায় রইলাম।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।

কুসংস্কার

বহু মানুষ এ যুগেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। অজ্ঞতা, মূর্খতার জন্যই এরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। সে জন্যই মালদা শহর থেকে দশ কিমি দূরে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এক গ্রামের এক পরিবারে তাদের মন্দিরে বিষধর জ্যান্ত সাপ রেখে নিয়মিত তার পুজো দেওয়া হচ্ছে। সাপটির মাথায় সিঁদুর। নিয়মিত স্নান করায়, খেতে দেয়। এসব বিষাক্ত সাপ পোষা ভুল। গ্রামে তাই সচেতনতা বাড়ানো দরকার। এভাবে বিষধর সাপ পোষা মানে নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনা।

শিপ্রা শিকদার
মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

প্রতিবাদ

কলকাতায় বহু মানুষ তেলেভাজা খেতে অভ্যস্ত। তেলেভাজার দোকান চলে রমরমিয়ে। কিন্তু এই তেলেভাজা তৈরিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে রাজি নয় কেউই। তাই পকোড়া নিয়েও প্রতিবাদ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থানের সমস্যায় পকোড়া বিক্রিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেননি, বরং উচ্চে তুলে ধরেছেন। তাতে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে কিছু কলেজ ছাত্র পকোড়া বিক্রি করে প্রতিবাদ জানালেন। আসলে দেশের যুবসমাজ চায় একটা সুখের চাকরি। পকোড়া বিক্রির কথায় তারা অপমানিত বোধ করে।

নৃপেন রায়
শিবমন্দির, দার্জিলিং।

প্রশ্ন বটে

কেরল বিধানসভার অধ্যক্ষ পি শ্রীরামকৃষ্ণন রাজ্য সরকারকে চশমার জন্যে (মাত্র) ৪৯,০০০ টাকার বিল ধরিয়েছেন। এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু ওঁরা হলেন জনপ্রতিনিধি। ওঁরা কি এর চাইতে সস্তার চশমা পরতে পারবেন ? পরা উচিত ?

সঞ্জীব বর্মন
কদমতলা, জলপাইগুড়ি।